# সুস্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই যখন সম্পদ...

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনও লেখা পাঠাতে আমাদের মেল করুন- dsnewsdesk@gmail.com

## পিতামাতার নেশা ও শিশুদের স্বাস্থ্যে নীরব প্রভাব

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মূল ভিত্তি হলো নিরাপদ, স্থিতিশীল ও যত্নশীল পারিবারিক পরিবেশ। কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন অসংখ্য শিশু রয়েছে, যারা বড় হয়ে উঠছে নেশাগ্রস্ত অভিভাবকের ছায়ায়। অ্যালকোহল, ধূমপান, অবৈধ মাদক কিংবা প্রেসক্রিপশন ওষুধের অপব্যবহার সব মিলিয়ে পিতামাতার নেশা আজ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, বরং একটি গুরুতর শিশুস্বাস্থ্য ও সামাজিক সংকট হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে, নেশাজনিত সমস্যায় আক্রান্ত পরিবারের শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

**নেশা: শুধু অভ্যাস নয়, একটি রোগ**

বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান নেশাকে একটি দীর্ঘস্থায়ী, পুনরাবৃত্তিমূলক রোগ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। নেশা মানুষের চিন্তাভাবনা, আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে। এর ফলে একজন অভিভাবক অনেক সময় বুঝতেই পারেন না যে তার আচরণ সন্তানকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবারে একজন নেশাগ্রস্ত সদস্য থাকলেই পুরো পরিবার একটি দীর্ঘমেয়াদি মানসিক চাপের পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়, যার সবচেয়ে ভুক্তভোগী হয় শিশুরা।

**শিশুদের মানসিক ও আবেগগত স্বাস্থ্যে প্রভাব**

নেশাগ্রস্ত অভিভাবকের সঙ্গে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রায়ই অনিশ্চয়তা ও ভয়ের মধ্যে থাকে।

আজ বাবা-মা স্বাভাবিক, কাল হয়তো উত্তেজিত বা অনুপস্থিত—এই অপ্রত্যাশিত আচরণ শিশুর মনে গভীর আঘাত সৃষ্টি করে।

**এই শিশুদের মধ্যে দেখা যায়;**

অতিরিক্ত উদ্বেগ ও ভয়,
বিষণ্ণতা,
আত্মসম্মানবোধের অভাব,
ঘুমের সমস্যা,
রাগ, আগ্রাসী আচরণ বা চুপ করে যাওয়া,
অনেক ক্ষেত্রে তারা নিজেদের দোষী মনে করে .....ভাবতে থাকে, "আমার জন্যই বাবা-মা এমন হয়ে গেছে।" এই মানসিক বোঝা তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে দীর্ঘস্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

**ডাঃ সায়ন কুমার দাস**

DNB Paediatrics (NBEMS, NEW Delhi), Tripura Health Services. Senior Resident,Deptt of Paediatrics,TMC and BRAM Teaching Hospital

**শারীরিক স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন যত্নে অবহেলা**

নেশাগ্রস্ত অভিভাবক অনেক সময় শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলিই পূরণ করতে ব্যর্থ হন।

এর মধ্যে রয়েছে—
সঠিক ও সময়মতো খাদ্য,
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা,
নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা,
টিকাকরণ,

**ফলস্বরূপ এই শিশুরা—**

অপুষ্টিতে ভোগে,
সংক্রমণজনিত রোগে বারবার আক্রান্ত হয়,
শ্বাসযন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের সমস্যায় পড়ে,
দুর্ঘটনাজনিত আঘাতে বেশি আক্রান্ত হয়,
বিশেষ করে অ্যালকোহল বা মাদক সেবনের ফলে বাড়ির পরিবেশ যখন অসুরক্ষিত হয়ে ওঠে, তখন শিশুদের জীবন পর্যন্ত ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

**শিক্ষা ও সামাজিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা**

এই ধরনের পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুরা প্রায়ই পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে পারে না।

**কারণ—**

ঘরে পড়ার অনুকূল পরিবেশ থাকে না,
মানসিক চাপ শেখার ক্ষমতা কমিয়ে দেয়,
স্কুলে যাওয়ার নিয়ম ভেঙে যায়।
ফলে তারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে, আত্মবিশ্বাস হারায় এবং ধীরে ধীরে স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা বাড়ে।

সমবয়সি শিশুদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তেও তারা সমস্যায় পড়ে। অনেক শিশু নিজেকে গুটিয়ে নেয়, আবার কেউ কেউ উল্টো পথে হেঁটে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে জড়িয়ে পড়ে।

**নির্যাতন ও অবহেলার অদৃশ্য বাস্তবতা**

গবেষণায় দেখা গেছে, নেশাগ্রস্ত পরিবারে শিশু নির্যাতনের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

**এটি হতে পারে—**

শারীরিক নির্যাতন,
মানসিক অত্যাচার,
মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত করা,
দীর্ঘ সময় একা ফেলে রাখা,
এই ধরনের অভিজ্ঞতা শিশুর মনে গভীর ট্রমা সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী জীবনে মানসিক রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

**প্রজন্মের পর প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়া ঝুঁকি**

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো—এই শিশুরা বড় হয়ে নিজেরাও নেশার প্রতি ঝুঁকতে পারে।

এভাবেই তৈরি হয় একটি প্রজন্মগত চক্র(intergenerational cycle), যেখানে এক প্রজন্মের সমস্যার বোঝা বহন করে পরবর্তী প্রজন্ম। যা সমাজের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর।

**সমাধানের পথ কোথায়? পরিবারভিত্তিক চিকিৎসা ও কাউন্সেলিং**

নেশাগ্রস্ত অভিভাবকের পাশাপাশি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

**স্কুল ও সমাজের সক্রিয় ভূমিকা**

শিক্ষক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যৌথভাবে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করতে হবে।

**সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন**

নেশাকে লজ্জার বিষয় না বানিয়ে চিকিৎসাযোগ্য রোগ হিসেবে দেখতে হবে।

**শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থার জোরদার**

হেল্পলাইন, কাউন্সেলিং ও পুনর্বাসন পরিষেবা সহজলভ্য করা জরুরি।

**উপসংহার**

পিতামাতার নেশা একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়—এটি একটি শিশুস্বাস্থ্য ও সামাজিক দায়িত্বের প্রশ্ন। আজ যে শিশু নীরবে কষ্ট পাচ্ছে, আগামী দিনে সেই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ। তাদের রক্ষা করা মানেই সমাজকে রক্ষা করা।

## ফুসফুসে জল জমলে ভয় পাবেন না, ডাক্তারের কাছে যান

ডাঃ কেকে পান্ডে

ফুসফুস আমাদের শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একবার একটি সাহিত্যে লেখা হয়েছিল, 'আমাদের শরীরের জন্য ফুসফুস ততটাই জরুরি, যতটা জীবনের জন্য অক্সিজেন।' এটি ঠিকমতো কাজ না করলে শরীরের সব কার্যক্ষমতাই প্রভাবিত হয়। যখন ফুসফুস সুস্থ থাকে, তখন শরীরও থাকে ভরপুর সতেজ, কিন্তু যখন এতে সমস্যা হতে শুরু করে, তখন পুরো শরীরই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ফুসফুসে জল জমা শুরু হলেই, শ্বাসকষ্ট এবং ক্লান্তি ভাব দেখা যায়। সেই সঙ্গে পা এবং পায়ের নিচের অংশের গোড়ালি ফুলতে থাকে। শরীর যদি পরিপূর্ণ অক্সিজেন না পায় তাহলেই শরীরে একটা অস্থিরতা দেখা যাবেই সেই সঙ্গে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে বাধ্য। ডাক্তারি পরিভাষায় ফুসফুসে জল জমাকে বলা হয় 'পালমোনারি এডেমা'। এধরনের রোগ অবহেলা করা কোনওভাবেই উচিত নয়, সময় থাকতে থাকতে চিকিৎসা না করালে তা প্রাণঘাতীও হতে পারে। বুকের ভেতরে উপস্থিত থাকা ফুসফুসের চারদিকে জল জমা'কে ডাক্তারি ভাষায় 'প্লুরাল ইফ্যুজন' অথবা 'হাইড্রোথোএক্স' বলা হয়। কিন্তু যখন জলের বদলে রক্ত জমা হয় তখন তাকে 'হিমোথোএক্স' বলে। আবার অনেক সময় লিম্ফ নামক তরল পদার্থ জমা হয়ে যায় তখন তাকে 'কাইলোথোএক্স' বলে হয়। ঘটনা হলো ফুসফুসের উপরের পৃষ্ঠের জল শোষণ করার ক্ষমতা থাকে। এই কারণে জল চুঁইয়ে পড়া এবং শোষণের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু কখনও কখনও ফুসফুসের উপরিভাগ থেকে জলের চুঁইয়ে পড়া অনেক বেড়ে যায় তখন এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় থাকে না। এইজন্য ফুসফুসের চারদিকে বুকের ভেতরে জল বা তরল পদার্থ একত্রিত হতে শুরু করে। আমাদের ফুসফুসে জলপূর্ণ হওয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো টিবি-র ইনফেকশন। যদি সময় থাকতেই টিবি'র ইনফেকশন যুক্ত হলুদ জল জমা আটকানো না যায় তাহলে ফুসফুস নষ্ট হওয়ার মতো গুরুতর পরিণামে ভুগতে হতে পারে।

**ফুসফুসে জল জমার অনেকগুলি কারণ আছে ----**

**নিউমোনিয়া**

নিউমোনিয়া একটি এমন রোগ যে এই রোগ হলে রোগীর শ্বাস নিতে সমস্যা হয়। এর ফলে বুকে জল জমতে শুরু করে। এই কারণে জমা জল দ্রুত পুঁজে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেটা খুবই গুরুতর সমস্যা।

**ক্যানসার**

আমাদের দেশে 'পালমোনারি এডেমা'র অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে ক্যানসারকে ধরা হয়। বুকে জল জমার পিছনে তিন ধরনের ক্যানসার মূলত দায়ী। ফুসফুস, ব্রেস্ট এবং গলার টনসিলের ক্যানসার।

**টিউমার**

অনেক রোগীদের ক্ষেত্রে টিউমারের কারণে তাদের ফুসফুসে জল জমতে থাকে। কিছু রোগীদের ক্ষেত্রে বুকের ভেতরে দেয়ালে টিউমার অর্থাৎ 'মেসোথেলিয়মা'-এর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। টিউমারের সমস্যাকে ঠিক করে প্রতিকার করা খুবই জরুরি না হলে এটি মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

**অন্য কারণ**

এই সকল কারণ ছাড়াও অন্য কারণেও ফুসফুসে জল জমার সমস্যা দেখা যায়। যেমন যকৃতের অসুখ অর্থাৎ লিভার সিরোসিস, পেটে জল জমলেও তা পরবর্তীতে ফুসফুসের জল সাম্যকে নষ্ট করে দেয়। আর এই ধরনের কোনও ঘটনার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু জ্বর। ঘামের সঙ্গে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলায় শরীর ভয়ঙ্কর ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি দ্রুত ওজন হ্রাস পায়। শ্বাসনালী এতটাই ফুলে যায় যে শ্বাস নেওয়ার সময় বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। আর এই ধরনের রোগ হয়েছে কিনা তা বাড়িতে ও বোঝা যায় সামান্য উপায়ে। শরীরকে সামনের দিকে একটু ঝাঁকালে বুকে গড় গড় করে আওয়াজ হয় রোগী বুঝতে পারেন তার বুকটা ভারী হয়ে যাচ্ছে। শ্বাসকষ্ট কিন্তু তখন সাধারণ পর্যায়ে থাকে না, চরম শ্বাসকষ্টে প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কাজ করার সময় বা শুয়ে থাকার সময় শরীর আরও খারাপ হতে থাকে। কথা সামান্য বললেও কাশি যা ফেনাযুক্ত থুতু বেরিয়ে আসে। যার মধ্যে রক্তও থাকতে পারে। অনিয়মিত হৃদস্পন্দন বা বুক ধড়ফড় করার মতো উদ্বেগ, অস্থিরতা বা খারাপ কিছু ঘটতে চলেছে এমন অনুভূতি সব সময় হতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠলে অতিরিক্ত ক্লান্তিবোধ হয়। এছাড়া আগেও বলেছি পা এবং গোড়ালি অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে ওঠে। ফুসফুসে জল জমলে শরীরের রক্ত সঞ্চালন প্রভাবিত হয়। এর কারণে পা এবং গোড়ালিতে ফোলাভাব দেখা দেয়। সাধারণত বুকের ভেতর থেকে সুঁচ বা ড্রেনেজ টিউবের সাহায্যে জল বের করা হয়, সঙ্গে কারণ অনুযায়ী (যেমন- সংক্রমণ, হার্ট বা কিডনির সমস্যা) ওষুধ বা অক্সিজেন দেওয়া হয়। জল নিষ্কাশন যাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় থোরাসেনটেসিস। চেস্ট টিউব বসিয়ে ফুসফুস থেকে জল বের করে প্রথমেই রোগীর শ্বাসকষ্ট কমানো হয়। তারপর ডাক্তারবাবুরা দেখেন জল কেন জমেছে। তা পরীক্ষার পর যক্ষ্মার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক বা ডাইউরেটিক্স দেওয়া হয়। রোগীর যদি শ্বাসকষ্ট বেশি হয় তাহলে ডাক্তারবাবু যদি মনে করেন রোগীকে অক্সিজেন সাপোর্টেও রাখতে পারেন।

এক্ষেত্রে রোগীকে আরামদায়কভাবে শোয়ানোটা খুব জরুরি। একটা কথা বারবার বলি, লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে পালমোনোলজিস্ট বা কার্ডিওথোরাসিক ভাস্কুলার সার্জেনের পরামর্শ নিতেই হবে। মনে রাখবেন ফুসফুসে জল জমার সমস্যা হলে ঘুম প্রভাবিত হবেই। গভীর ঘুমের মধ্যে বার বার ঘুম ভেঙে যাওয়া, বালিশ ছাড়া ঘুম না আসা এই প্রাথমিক লক্ষণগুলি হলেই বুঝতে হবে ফুসফুসের সঠিকভাবে কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। আর আপনি এক মুহূর্তে জন্য সময়কে অপচয় না করে চিকিৎসকের কাছে যান। চিকিৎসা দ্রুত করালে এই জটিল রোগ থেকে রোগীকে সারানো সম্ভব।

**(লেখক পরিচিতি: সিনিয়র কনসালটেন্ট ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারি এবং ডিপার্টমেন্ট অফ থোরাসিক অঙ্কোসার্জারি; অ্যাপোলো হার্ট ইন্সটিটিউট)**

## রোবটিক সার্জারিতে জটিল জরায়ু মুখ ক্যান্সারের চিকিৎসায় নতুন আশা

জরায়ু মুখ ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে কলকাতার অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল উন্নত রোবটিক সার্জারির মাধ্যমে এক জটিল ও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্যান্সার অস্ত্রোপচারে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। পুনরায় ফিরে আসা সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারে আক্রান্ত এক মেনোপজ-পরবর্তী মহিলার সফল চিকিৎসা করে হাসপাতালটি আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকারিতা ও চিকিৎসকদের দক্ষতার নজির স্থাপন করেছে। হাসপাতালের গাইনোকোলজিক্যাল অনকোলজি ও রোবটিক সার্জারি বিশেষজ্ঞ ডাঃ মনিকা মীনা-র নেতৃত্বে এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়।

৫৫ বছর বয়সি ওই রোগী কয়েক মাস আগে অন্য একটি হাসপাতালে লোকালি অ্যাডভান্সড স্টেজ থ্রি জরায়ু মুখ ক্যান্সারের জন্য কেমোথেরাপি ও রেডিয়েশন থেরাপি নিয়েছিলেন। চিকিৎসা সম্পন্ন হওয়ার প্রায় ছয় মাস পর তিনি আবারও অস্বাভাবিক উপসর্গ অনুভব করলে পরীক্ষা করান। PET-CT (Positron Emission Tomography – Computed Tomography) স্ক্যানে জরায়ুর মুখে প্রায় ২ সেন্টিমিটার আকারের একটি ক্যান্সারজনিত ক্ষত ধরা পড়ে, যা রোগটির পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত দেয়। তবে বিস্তারিত পরীক্ষায় জানা যায়, ক্যান্সারটি শরীরের অন্য কোনও অঙ্গে ছড়ায়নি এবং কেবলমাত্র মূল স্থানেই সীমাবদ্ধ ছিল।

রোগীর শারীরিক অবস্থা ও সমস্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পর অ্যাপোলো হাসপাতালের চিকিৎসক দল তাকে একটি বিশেষ ধরনের অস্ত্রোপচার 'সালভেজ হিস্টেরেক্টমি' করার পরামর্শ দেন। রেডিয়েশন থেরাপির পর এই ধরনের অস্ত্রোপচার অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করা হয়, কারণ রেডিয়েশনের ফলে টিস্যু শক্ত ও ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং ভেতরে স্কারিং তৈরি হয়। এর ফলে রক্তপাত, সংক্রমণ কিংবা পার্শ্ববর্তী অঙ্গের ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই জটিল পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ নির্ভুলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চিকিৎসক দল রোবটিক সার্জারির সিদ্ধান্ত নেন। রোবটিক পদ্ধতিতে রোগীর জরায়ু, জরায়ু মুখ এবং ক্যান্সার আক্রান্ত পার্শ্ববর্তী টিস্যু অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অপসারণ করা হয়। সার্জারির সময় রক্তপাত ছিল ন্যূনতম এবং কোনও বড় জটিলতা দেখা যায়নি। মিনিমালি ইনভেসিভ অর্থাৎ আধুনিক যন্ত্র বা রোবটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট জায়গায় ছোট ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে অস্ত্রোপচার হওয়ার ফলে রোগী অস্ত্রোপচারের দিনেই হাঁটাচলা শুরু করতে সক্ষম হন এবং পরদিনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। পরবর্তী প্যাথোলজি রিপোর্টে নিশ্চিত করা হয়েছে যে ফিরে আসা ক্যান্সারটি সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা সম্ভব হয়েছে।

**Dr. Monika Meena**

Robotic Surgery
Apollo Hospital

এই সাফল্য প্রসঙ্গে ডাঃ মনিকা মীনা বলেছেন, মেনোপজের পর যে কোনও ধরনের অস্বাভাবিক রক্তপাতকে কখনওই অবহেলা করা উচিত নয়। দ্রুত পরীক্ষা করালে এবং সময়মতো সঠিক চিকিৎসা শুরু করলে জরায়ু মুখ ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। রোবটিক সার্জারির মতো আধুনিক প্রযুক্তি আজ আমাদেরকে অত্যন্ত জটিল ও উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্যান্সার সার্জারিও নিরাপদে সম্পন্ন করতে সাহায্য করছে। এর ফলে রোগী অনেক কমসময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠতে পারছেন।

ভারতে জরায়ু মুখ ক্যান্সার নারীদের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বে যত সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার রোগী রয়েছেন, তাদের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন ভারতের এবং এই রোগে বিশ্বব্যাপী মোট মৃত্যুর প্রায় ৫০ শতাংশই ঘটে এই দেশে। অথচ এই ক্যান্সারটি মূলত প্রতিরোধযোগ্য। অস্বাভাবিক রক্তপাত, অস্বাভাবিক স্রাব বা তলপেটে ব্যথার মতো প্রাথমিক উপসর্গ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং HPV টিকাকরণ ও নিয়মিত স্ক্রিনিং টেস্ট সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই রোগ নির্ণয়ে দেরি হয়ে যায়। জানুয়ারী মাস জরায়ু মুখ ক্যান্সার সচেতনতা মাস হিসেবে পালিত হয়। অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের এই সফল অস্ত্রোপচারটি সময়মতো রোগ নির্ণয়, প্রাথমিক লক্ষণ চেনা এবং আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তির গুরুত্বকে নতুন করে সামনে নিয়ে এল। বিশেষজ্ঞদের মতে, HPV ভ্যাকসিন গ্রহণ এবং নিয়মিত প্যাপ স্মিয়ার বা HPV স্ক্রিনিং টেস্টের মাধ্যমে এই মারণ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

**অনুলিখন : আনন্দিতা সরকার**

## পরিবেশ দূষণে বাড়ছে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, কলকাতায় ইএনটি বিশেষজ্ঞদের জাতীয় সম্মেলন

বিশ্বে পরিবেশ দূষণের নিরিখে ভারতের স্থান পঞ্চম। ক্রমবর্ধমান এই দূষণের সরাসরি প্রভাব পড়ছে মানুষের স্বাস্থ্যে, বিশেষ করে নাক-কান-গলা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যায়। দূষণের কারণে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নাক দিয়ে জল পড়া, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, জ্বালা, চুলকানি, কাশি ও সর্দি---- এই রোগের সাধারণ উপসর্গ। চিকিৎসকদের মতে, দূষণের ফলে সাধারণ সর্দিও জটিল আকার ধারণ করছে এবং মানুষ অ্যালার্জেনের প্রতি অতিসংবেদনশীল হয়ে উঠছেন। সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে ভুগছেন। এছাড়া দেশের ১৯টি রাজ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশ মানুষের সর্দি ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত সমস্যার মূল কারণ পরিবেশ দূষণ। এই পরিস্থিতিতে অ্যালার্জিক রাইনাইটিসকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রায় ৯ বছর পর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞদের ৭৭তম জাতীয় সম্মেলন। অ্যাসোসিয়েশন অব অটোল্যারিঙ্গলজিস্টস অব ইন্ডিয়া (AOI) -- এর উদ্যোগে আয়োজিত এই বার্ষিক সম্মেলন AOICON-২০২৬, ৮ থেকে ১১ জানুয়ারী বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের প্রাক্কালে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে AOI-এর জাতীয় সভাপতি ডা. দ্বৈপায়ণ মুখার্জি জানিয়েছিলেন, দেশ-বিদেশের প্রায় ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ ইএনটি বিশেষজ্ঞ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন। সেই কথামতোই এই সম্মেলনে অত্যাধুনিক ইএনটি চিকিৎসা ও সার্জারির পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের প্রভাবে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, ভার্টাইগো, শব্দ দূষণজনিত শ্রবণ সমস্যা এবং ইএনটি চিকিৎসার ইন্ডিয়ান গাইডলাইন নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়েছে। শহরাঞ্চলে শব্দ দূষণের ফলে শ্রবণ ক্ষমতাও যে ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেই বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি দীর্ঘদিন অ্যালার্জিক রাইনাইটিসে ভুগলে রোগীর হাঁপানিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে---- এ কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে প্রমাণিত, সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে অনুষ্ঠানে। সম্মেলনের কার্যনির্বাহী সম্পাদক ডা. স্নেহাশিষ বর্মণের পূর্বকথামতো, AOICON-২০২৬- এর প্রথম দিন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস নিয়ে সারাদিনব্যাপী বিশেষ ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। এই ওয়ার্কশপে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি বিশ্বের খ্যাতনামা অ্যালার্জি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে তরুণ চিকিৎসকদের হাতে-কলমে অ্যালার্জি টেস্ট ও স্কিন প্রিক টেস্টের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে দেশে ইউরোপ ও আমেরিকার গাইডলাইন অনুসরণ করেই অধিকাংশ চিকিৎসা হয়। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ, অ্যালার্জেন ও মানুষের জিনগত বৈশিষ্ট্য ভারতের থেকে আলাদা। তাই ভারতীয় প্রেক্ষাপটে একটি নিজস্ব চিকিৎসা গাইডলাইন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে জানান ডা. দ্বৈপায়ণ মুখার্জি। এই লক্ষ্যে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস চিকিৎসার একটি 'রেডি রেকনার' সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হয়েছে বলেও জানা গেছে।

AOI - এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি ও সম্মেলনের কার্যনির্বাহী সভাপতি ডা. উৎপল জানা জানান, ইএনটি চিকিৎসার মেডিকো-লিগ্যাল দিক নিয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে চিকিৎসকদের জন্য চিকিৎসার আইনগত দিক সম্পর্কে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি। সম্মেলনে ভার্টাইগো নিয়েও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ মানুষ ভার্টাইগোতে ভুগছেন এবং প্রায় ১৮ কোটি মানুষের মাথা ঘোরা ও মাথা ঝিমঝিমের সমস্যা রয়েছে। এ বিষয়ে বিশ্বের অন্যতম সেরা চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে একটি অত্যন্ত গুরুপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এছাড়াও কসমেটিক ফেসিয়াল সার্জারি, রাইনোপ্ল্যাস্টি ও ইয়ারলোব সার্জারি নিয়ে বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ব্রিটেনের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. উল্লাস রাঘবন। চার দিনব্যাপী এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জাপান, ব্রাজিল, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। AOICON-২০২৬ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেন এবং প্রাক্তন এয়ার চিফ মার্শাল অরূপ রাহা। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলার পক্ষে গর্বের বিষয়, অ্যাসোসিয়েশন অব অটোল্যারিঙ্গলজিস্টস অব ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে কলকাতায় এই জাতীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এটা প্রকৃতই এক অভিনব উদ্যোগ।

**অনুলিখন : আনন্দিতা সরকার**